ড্রোন ওয়ার

আকাশে উড়ন্ত মৃত্যু

ড্রোন ওয়ার

সেথ জে ফ্রান্টজম্যান

ফাউন্টেন
পা বলি কে শ ন্স

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা **৯**
প্রারম্ভিকা **১১**

ভূমিকা

আতঙ্কের শহর **১৮**

প্রথম অধ্যায়

ড্রোনের ভোর : কারা অগ্রগামী? **২৫**
একঘেয়ে, নোংরা এবং বিপজ্জনক ২৯
আগামী দিনের যুদ্ধ : অপারেশন পিস ফর গ্যালিলি ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাশের গুপ্তচর : নজরদারি **৪১**
অরিজিন অব স্পিসিস ৪২
মডেল তৈরি ৪৪
বিগ সাফারি ৫১
ডার্ক স্টার ৫৩
দ্য গ্রেট ডিবেট ৫৯
লিন্ডবার্গের পায়ের ছাপ ধরে ৬২
খরচের হিসাবনিকেশ ৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

আকাশ থেকে নেমে আসা হেলফায়ার, মিসাইল নিয়ে উড়ন্ত ড্রোন **৭১**
আমরা কি এতে অস্ত্র বসাতে পারি? ৭৩
চোখের সীমানার বাইরে ৮১
হান্টার কিলার বা শিকারি খুনি ৮৫

চতুর্থ অধ্যায়

খুনে যন্ত্র : ড্রোন যুদ্ধের নৈতিকতা **৯৭**
যুদ্ধাপরাধ ১০১
লাগাম টেনে ধরা ১১০
বিস্তার ১১৩

পঞ্চম অধ্যায়

শত্রুর কব্জায় : সন্ত্রাসীদের হাতে নিজেদের ড্রোন **১১৭**
বহুদূরের থাবা ১২৬
কালো পতাকা ১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাল্টা লড়াই : ড্রোনের বিরুদ্ধে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা **১৩৯**
ব্রেকথ্রু ১৪১
বিশ বছরের ভাবনা ১৪৯

সপ্তম অধ্যায়

ড্রোনের ঝাঁক : সমস্ত ডিফেন্স তছনছ করে দেওয়া **১৬০**
ইসরায়েলে, ব্রিগেডিয়ার ১৬২
স্টার ট্রেক থেকে রোবোকপ ১৬৪
সোয়ার্ম টেকনোলজির ম্যাজিক ১৭২

অষ্টম অধ্যায়

আরো ভালো, আরো শক্তিশালী, আরো দ্রুত : এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা **১৭৮**
সস্তা, অতি গোপন আর অদ্ভুতুড়ে ১৮১
গোপন কথা ১৮৮
পৃথিবী এগোচ্ছে আপন গতিতে ১৯১

নবম অধ্যায়

আসন্ন ড্রোন যুদ্ধ : এক নতুন রণাঙ্গন **২০০**
দানবীয় ড্রোন ২১০
উড়ন্ত ড্রাগন ২১৫
যুগান্তকারী সাফল্য ২২২
ড্রোন আর রাশিয়ান ভালুকের মোলাকাত ২৩০
জয়-পরাজয়ের হিসাবনিকাশ ২৩৬
কিছু জরুরি শিক্ষা ২৩৯

দশম অধ্যায়

ড্রোন এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স : ডুমসডে সিনারিও **২৪৩**
অ্যালগরিদম : লুপের ভেতর মানুষ ২৪৭
ঘোড়ার রেকাব এবং ক্রসবো ২৬০
দুটি আলাদা মতবাদ : কেমন হবে আগামী দিনের যুদ্ধ ২৬৪

শেষ কথা **২৬৭**

প্রকাশকের কথা

যুদ্ধের ইতিহাসে কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে, যেগুলো কেবল একটি নতুন অস্ত্রের আবির্ভাব নয়—বরং পুরো যুদ্ধদর্শনকেই বদলে দেয়। বারুদের আবিষ্কার যেমন মধ্যযুগের যুদ্ধকে পাল্টে দিয়েছিল, ট্যাংক যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্থবিরতাকে ভেঙেছিল, তেমনি আমাদের সময়ের যুদ্ধকে এক নতুন বাস্তবতায় নিয়ে এসেছে ড্রোন। ড্রোন ওয়ার বইটি সেই পরিবর্তনের এক গভীর, শ্বাসরুদ্ধকর এবং চিন্তাশীল দলিল।

এই বইয়ের পাতা উল্টালেই আমরা বুঝতে পারি—ড্রোন কোনো ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়; এটি ইতোমধ্যেই বর্তমানের যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু। মসুলের গলি থেকে শুরু করে সিরিয়া, লিবিয়া কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত সংঘাতে—ড্রোন এখন আর কেবল নজরদারির যন্ত্র নয়, বরং আক্রমণ, প্রতিরক্ষা এবং মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্যের এক সর্বগ্রাসী মাধ্যম। আকাশে ভনভন শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ানো একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র কীভাবে হাজার সৈন্যের কৌশল বদলে দিতে পারে, কীভাবে যুদ্ধের ভারসাম্য মুহূর্তেই পাল্টে দিতে পারে—এই বই তারই বাস্তব, নির্মম ও প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির উত্তপ্ত প্রেক্ষাপটে—বিশেষত ইরান ও আমেরিকার চলমান উত্তেজনা ও সংঘাতের ধারাবাহিকতায়—ড্রোন এখন এক নির্ধারক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একদিকে উচ্চপ্রযুক্তির স্ট্রাইক ড্রোন, অন্যদিকে তুলনামূলক কম খরচের কিন্তু কৌশলগতভাবে ভয়ংকর 'সোয়র্ম' বা ঝাঁক ড্রোন—এই দুইয়ের সংঘর্ষ আজকের যুদ্ধকে করেছে অসম, দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং আরও অনিশ্চিত। একটি বোতাম চাপার দূরত্বে বসে থাকা অপারেটর, হাজার মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানছে—এই বাস্তবতা কেবল সামরিক কৌশলই নয়, নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা এবং মানবতার প্রশ্নকেও নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

এই বইয়ের আরেকটি বড় শক্তি হলো এর ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। লেখক কেবল প্রযুক্তির বিস্ময় বর্ণনা করেননি; তিনি তুলে ধরেছেন এর অন্ধকার দিকও—টার্গেটেড কিলিং, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে ড্রোনের ব্যবহার, এবং এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যেখানে মানুষ নয়, মেশিনই হয়তো সিদ্ধান্ত নেবে জীবন-মৃত্যুর। একই সাথে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে বিশ্বশক্তিগুলো—আমেরিকা, ইসরায়েল, চীন, তুরস্ক কিংবা ইরান—এই প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে ব্যস্ত।

একজন প্রকাশক হিসেবে আমি মনে করি, ড্রোন ওয়ার কেবল একটি সামরিক বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ নয়; এটি আমাদের সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যারা আধুনিক যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, প্রযুক্তির বিবর্তন কিংবা ভবিষ্যৎ বিশ্বের গতিপথ বুঝতে চান—তাদের জন্য এই বই অপরিহার্য পাঠ।

আমরা এমন এক যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে যুদ্ধের ময়দান ক্রমেই মানবশূন্য হয়ে উঠছে, কিন্তু তার প্রভাব আরও গভীরভাবে মানবজীবনকে স্পর্শ করছে। এই বাস্তবতাকে বুঝতে হলে, এই পরিবর্তনের ভাষা জানতে হলে, এবং সামনে কী আসছে তা উপলব্ধি করতে হলে—এই বই আমাদের এক অনন্য পথপ্রদর্শক।

পাঠকের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত। আশা করি, এটি কেবল জ্ঞান দেবে না—চিন্তার নতুন দুয়ারও খুলে দেবে।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০৬-৪-২০২৬

প্রারম্ভিকা

কংক্রিটের সিঁড়িটায় একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। নিচ থেকে ভেসে আসছিল গোলাগুলির শব্দ। আর উপরে, মসুল শহরের এই তিনতলা ভবনের ছাদে ওঠার ছোট দরজাটার ওপাশে, একটানা অস্পষ্ট একটা ভনভন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিছুটা দূরে, কোনো একটা তোশকের আড়ালে বা ঠিক এমনই কোনো সিঁড়ির কোণায় ঘাপটি মেরে বসে আছে এক আইসিস স্নাইপার। তার চোখ আমাদের ওপর। ইরাকি মেজর কথাটা বলেই তার তিন সৈন্যকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার ইশারা করলেন। উদ্দেশ্য, গলিপথের দিকে মুখ করা দেয়ালের ভাঙা অংশটা এড়িয়ে যাওয়া। সময়টা ২০১৭ সাল, জায়গাটা ইরাক।

আমরা তখন শিকার। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও আমরা এই শহরে ঢুকেছিলাম শিকারি হিসেবে। আমাদের পেছনে ছিল মার্কিন বিমান বাহিনীর বিশাল সাপোর্ট, ছিল অফুরন্ত গোলাবারুদ, হামভি আর অসংখ্য সৈন্য। কিন্তু শত্রুরা এখানে আগে থেকেই প্রস্তুত। তাদের সস্তা অস্ত্রগুলো ছিল মারাত্মক ভয়ংকর। বিশেষ করে মাটির নিচের কারখানায় বানানো গ্রেনেড আর মর্টার যুক্ত কোয়াডকপ্টার ড্রোনগুলো। বাড়িঘর আর বোমায় ঠাসা গাড়িগুলোতে পেতে রাখা তাদের মরণফাঁদগুলোও ছিল সমান ভীতিজনক। তবে একটা আইসিস ড্রোনের সেই একটানা ভনভন শব্দটা আমি এত বছর পরও যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। শব্দটা একটানা এবং স্নায়ু বিকল করে দেওয়ার মতো। ঠিক যেন দূরের কোনো বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি আর যুদ্ধের অন্য সব শব্দের মতো। এটি আসলে এক নতুন প্রজন্মের যোদ্ধাদের আগমনী বার্তা। ড্রোন যোদ্ধা।

যুদ্ধের আগে ড্রোনের এই হুমকিটাকে বেশ অবাস্তব আর দূরের কোনো ব্যাপার মনে হতো। আমরা তখন ইরাকি বাহিনীর একটা অস্থায়ী ঘাঁটিতে। এটি আসলে এক সাধারণ মানুষের একতলা বাড়ি, যেটা একটা ছোট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। বাড়িটাকে এখন সৈন্যদের থাকার জায়গা বানানো হয়েছে। এক ইরাকি সৈন্য

কংক্রিটের দেয়ালে ঘেরা উঠোনে কালো প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে তার বুটের ফিতা বাঁধছিল। বুটগুলোর রং খাকি, নিচের দিকে বেশ কিছু কাদার দাগ লেগে আছে। সে ফিতাগুলোকে শক্ত করে টেনে ওপরের হুকগুলোর সাথে পেঁচিয়ে নিচ্ছিল, গোড়ালির সাথে যেন বুট জোড়া একেবারে সেঁটে থাকে।

সে ইমার্জেন্সি রেসপন্স ডিভিশন বা ইআরডির একজন সদস্য। এটি ইরাকি সেনাবাহিনীর এমন একটা ইউনিট, চরম সংকটের মুহূর্তে যাদের মাঠে নামানোর কথা। আজ এবং গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, এই ইআরডি ইউনিট মসুল শহরের পশ্চিম প্রান্তে ঢোকার জন্য আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। আইসিসের ভয়াবহ থাবা থেকে শহরটিকে মুক্ত করার এই অভিযান তখন পঞ্চম মাসে পা দিয়েছে।

আমি মসুলে এসেছিলাম একটা প্রতিজ্ঞার কারণে। ২০১৪ সালে ঠিক এখানেই আইসিস তাদের খেলাফত ঘোষণা করেছিল। এরপর তারা সিরিয়া ও ইরাকের কিছু অংশ দখল করে নেয় এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর ওপর গণহত্যা শুরু করে। মসুলের পথে আসতে আসতে নিনেভেহর সমভূমিতে থাকা খ্রিস্টানদের একসময়ের কোলাহলপূর্ণ কিন্তু এখনকার জনশূন্য শহরগুলো যেন আইসিসের ধ্বংসলীলারই বোবা সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কারাকোশ শহরে গির্জাগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা বোমা বানানোর কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে সেগুলোর ক্রুশ। কিছু কিছু গ্রামে আইসিস প্রতিটি বাড়িকেই এক একটা ছোটখাটো দুর্গে পরিণত করেছিল। বাড়িগুলোর নিচে ছিল সুড়ঙ্গ আর দেয়ালগুলো ভেঙে রাস্তা বানানো হয়েছিল। কারণ একটাই, তাদের যোদ্ধারা যেন এক ঘর থেকে অন্য ঘরে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে এবং ওপর থেকে মার্কিন ড্রোনগুলো তাদের দেখতে না পায়।

এখন ইরাকি সেনাবাহিনী মসুলে আইসিসকে চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে। শহরের ভেতর শত্রুরা পুরোপুরি অবরুদ্ধ। ৫,০০০ জিহাদির বিপরীতে লড়াই করছে প্রায় ৬০,০০০ ইরাকি সৈন্য। ২০১৬ সালের শরতে ইরাকি স্পেশাল ফোর্সের কাউন্টার টেরোরিস্ট সার্ভিস প্রতিটি রাস্তায় লড়াই করে শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিল।

২০১৭ সালের বসন্তকাল। আমি তখন একজন সাংবাদিক হিসেবে পশ্চিম মসুলকে শত্রুমুক্ত করার দায়িত্বে থাকা ইরাকি ইউনিটের সাথে মাঠে নেমেছি। মসুলের যুদ্ধটা এতই ভয়াবহ ছিল যে, পুরো ইউনিটগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সারি সারি হামভি গাড়ি হারিয়ে বসেছিল। সেই মার্চে আমরাই ছিলাম পরবর্তী দল, যাদের ওই

মৃত্যুফাঁদে পা দেওয়ার কথা। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, শহরটা যেদিন স্বাধীন হবে, সেদিন ইরাকিদের সাথে আমিও সেখানে থাকব। বেশ বোকামির সাথেই আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা হবে ১৯৪৫ সালে বার্লিনে ঢোকার মতো, নিজের চোখে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হতে দেখব।

বুট জুতো পরা সেই লোকটা, যার মাথার ঘন কালো চুলগুলো একেবারে ছোট করে ছাঁটা, তার ক্রোয়েশিয়ান ভিএইচএস-ডি২ রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। রাইফেলটার সামনের দিকটা বুল পাপ স্টাইলের, আর ট্রিগারের ঠিক পেছনেই ম্যাগাজিন বসানো। দেখতে বেশ আধুনিক আর ভবিষ্যতের কোনো অস্ত্রের মতো লাগছিল জিনিসটাকে। আমরা যে ধরনের যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছিলাম, তার সাথে এটা একদম মানানসই। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আইসিস ইরাকি সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালানোর জন্য ব্যাপক হারে ড্রোন ব্যবহার শুরু করে। প্রায় প্রতিদিনই এসব ড্রোনের দেখা মিলত। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য যেসব কোয়াডকপ্টার ড্রোন প্রযুক্তির দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, যেগুলোতে ছোট ছোট চারটা হেলিকপ্টার ব্লেড থাকে, আইসিস সেগুলোকে ওপর থেকে নেমে আসা যমদূতে পরিণত করার জন্য রীতিমতো কারখানা বানিয়ে ফেলেছিল। আইসিস সেগুলোতে গ্রেনেড আর মর্টার যুক্ত করত এবং হামলার ভিডিও ধারণ করার পাশাপাশি নজরদারির কাজেও ব্যবহার করত।

ড্রোনের এই হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো উপায় ছিল না। সৈন্যরা আকাশের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি চালানোর চেষ্টা করেছিল ঠিকই। কিন্তু একশ গজ দূর থেকে হাতের কনুইয়ের সমান আকৃতির একটা উড়ন্ত ড্রোনকে গুলি করে নামানো বেশ কঠিন কাজ। কিছু ইরাকি এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী ড্রোনগুলোকে জ্যাম করার চেষ্টা করেছিল। সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল অদ্ভুত দর্শনের সব জ্যামার গান। অ্যান্টেনা লাগানো বড়সড় খেলনা পিচকারির মতোই দেখতে ছিল সেগুলো। কিন্তু এই জ্যামিং ব্যবস্থাটা ছিল বেশ দুর্বল। আর সেই বুট পরা লোকটার মতো সাধারণ সৈন্যদের এগুলো চালানোর কোনো প্রশিক্ষণও ছিল না।

মার্চের শেষের দিকের সেই দিনটায় মসুল শহরে ঢোকার সময় ড্রোনের হুমকির সামনে নিজেদের একেবারে অসহায় মনে হচ্ছিল। স্নাইপার বা মর্টারের চেয়েও এর ভয়টা সবসময় কাজ করত, কারণ এটা আসত একদম মাথার ওপর থেকে এবং দেখতেও লাগত ভিনগ্রহের কোনো কিছুর মতো। মসুলে যাওয়ার জন্য আমরা

হামাম আল আলিল শহর থেকে গাড়ি চালিয়ে রওনা হয়েছিলাম। আইসিস সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ আর গণকবরের এক ভয়াবহ ছাপ রেখে গিয়েছিল। আমরা মাঠ আর প্রান্তর পেরিয়ে মসুলের সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানবন্দরে পৌঁছালাম। বিমানবন্দরের পশ্চিম প্রান্তে থাকা কারখানাগুলো পরিণত হয়েছিল পৃথিবীর শেষ দিনগুলোর মতো কোনো এক বিরানভূমিতে। চারপাশ একদম জনমানবহীন, সব জানালা ভাঙা আর স্টিলের কাঠামোর জাল থেকে কংক্রিটের বড় বড় খণ্ড ঝুলছে। আমরা ছিলাম একটা এসইউভিতে। আমাদের সামনে ছিল একটা ইরাকি হামভি এবং ইআরডি সৈন্যবোঝাই একটা ক্যামোফ্লেজ করা ভ্যান। শহরের এই এলাকাটা এক সপ্তাহ আগেই মুক্ত করা হয়েছিল। সৈন্যরা গান বাজাচ্ছিল, বাতাসে ভেসে আসছিল ধর্মীয় সংগীতের সুর। গানের সুর আর ইঞ্জিনের শব্দের মাঝে আমরা বেশ নিরাপদই বোধ করছিলাম। তবে গাড়ি থামানোর পরপরই আমরা চারপাশ থেকে পপ পপ করে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম।

ইআরডির একজন অফিসার, যিনি ওই বুট পরা লোকটার চেয়েও লম্বা ছিলেন আর যার গালে বয়সের কিছুটা ছাপ পড়তে শুরু করেছিল, তিনি মাথাটা একটু কাত করে বললেন, ড্রোন?

দূর থেকে একটা ভনভন শব্দ ভেসে আসছিল। আমরা তখন এমন একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে, যেটা একসময় একটা প্রধান সড়ক ছিল। রাস্তাটার মাঝ বরাবর একটা বিভাজন, আর একটা রাস্তা চলে গেছে দোতলা ডুপ্লেক্স বাড়ি ঘেরা একটা পাড়ার দিকে। ভনভন শব্দটা আসছিল আর যাচ্ছিল। আমরা ওপরের দিকে তাকালাম। ওটা ওখানেই কোথাও একটা আছে। একটা ড্রোন। আমাদের না ওদের? কেউই জানে না। ইরাকি সৈন্যদের একজন বলল, হাঁটার সময় রাস্তার একপাশ ঘেঁষে হাঁটবেন। তাই আমরা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। পথে পড়ল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আর বাগান করার সরঞ্জাম বিক্রির দোকান, যার সবই তখন পরিত্যক্ত। কয়েকটা ব্লক পার হওয়ার পর আমরা অবশেষে একটা ছোট গলির সামনে এসে পৌঁছালাম। এখানে সৈন্যরা গলির প্রতিটি মোড়ে মোড়ে পর্দা টানিয়ে রেখেছিল। গলির ভেতর একটানা মেশিনগানের গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ব্লকের একদিকটা ছিল আইসিসের দখলে আর অন্য দিকটা ইরাকিদের। স্নাইপারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাদের প্রতিটি গলি দৌড়ে পার হওয়ার কথা। এরপর একটা ছোট কাঠের মই বেয়ে একটা বাড়ির দোতলায় ওঠার কথা। এরপর বাড়ির একটা ভাঙা গর্ত দিয়ে আমরা দোতলা হয়ে একেবারে ছাদে পৌঁছে যাব। আমি দৌড়ালাম, দেয়াল বেয়ে উঠলাম, হামাগুড়ি দিলাম এবং বাড়িটার

গোলকধাঁধার মতো অসংখ্য ঘর পেরিয়ে মাঝখানের একটা সিঁড়ির কাছে পৌঁছালাম। সিঁড়ির একেবারে ওপরে একজন ইরাকি অফিসার হাত উঁচিয়ে ডানদিকে ইশারা করলেন। ওখানে স্নাইপার আছে। আমার ধারণা, ওপরের দিকে ইশারা করে তিনি মূলত ড্রোনের উপস্থিতির কথাও বোঝাতে চেয়েছিলেন।

সেই দিন ওই দমবন্ধ করা সিঁড়ি থেকে আমরা একদম অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। ইআরডির একজন সৈন্য ভবনের ছাদ থেকে একটা আরপিজি ফায়ার করল। তারপর আমরা আবার গলির সেই গোলকধাঁধায় ফিরে এলাম। স্নাইপারদের দৃষ্টি আড়াল করতে রাস্তার ওপরে সুন্দর সব কম্বল ঝোলানো ছিল। আইসিস পিছু হটা এবং শহরটা মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আরও কয়েক মাস ড্রোনগুলো তাদের এই ভয়ংকর কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ইরাক এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট আইসিসকে খুঁজে বের করতে এবং তাদের ড্রোন তৈরির কারখানাগুলো ধ্বংস করতে নিজেদের ড্রোন ব্যবহার করত। শুরু হয়ে গিয়েছিল ড্রোন যুদ্ধ।

পরবর্তী কয়েকদিন ইরাকের কুর্দিশ অঞ্চলের এরবিলের একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে বসে আমার একই সাথে স্বস্তি এবং মানসিক চাপ অনুভব হচ্ছিল। ভবিষ্যৎ থেকে আসা এই যন্ত্রগুলো আসলে কী, যা যুদ্ধের ধরনটাই একেবারে বদলে দিতে চাইছে? ব্লেড রানার বা টার্মিনেটর টু এর মতো সিনেমাগুলোতে ড্রোনের দেখা মেলে। এগুলো কখনো ভয়ংকর, আবার কখনো বিশ্বস্ত মিত্র। আজকের দিনে রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চলা ড্রোন যুদ্ধ বেশ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। সিরিয়া থেকে লিবিয়া, আফগানিস্তান, ইরান এবং কাশ্মীর, সব বড় বড় সংঘাতের প্রতিটি পক্ষই এখন ড্রোনের ব্যাপক ব্যবহার করছে।

আমরা এই পর্যায়ে এলাম কীভাবে? এই প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ আসলে কী? যুদ্ধবিমানের কাজগুলো যদি আমরা ড্রোন দিয়েই সেরে ফেলতে পারি, তাহলে কি কোটি কোটি ডলারের যুদ্ধবিমানের আর কোনো দরকার পড়বে? ভবিষ্যতের কোনো টপ গান পাইলট কি নেভাদার কোনো এক বদ্ধ ঘরে বসে আট হাজার মাইল দূরের শত্রুর ড্রোন ভূপাতিত করবে?

২০১৭ সালের মার্চে মসুলের একটা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সৈন্য। আইসিসের ড্রোনের হুমকি কেটে যাওয়ার পর ইরাকি সৈন্যরা পুরোনো মসুল শহরের যুদ্ধে ছাদের ওপর ভারী অস্ত্র স্থাপন করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তাদের একটা চোখ সবসময় আকাশের দিকেই থাকত।

আইসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে উঠে আসা এই পৃথিবীর দিকে আমি যত বেশি তাকাচ্ছিলাম, বিষয়টা ততই পরিষ্কার হচ্ছিল যে, যুদ্ধের পরবর্তী ধাপে রাজত্ব করবে ড্রোন আর মানবহীন সব প্রযুক্তি। সেখানে ভরে থাকবে আধুনিক গ্যাজেট এবং অটোনোমাস ওয়েপনস সিস্টেম বা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন এলিয়েন্স সিনেমায় দেখানো জগতটা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করত।

ওই সিনেমায় এমন কিছু দৃশ্য আছে, যা বুঝিয়ে দেয় আমরা ঠিক কোন দিকে এগোচ্ছি। সেখানে দেখা যায়, সৈন্যরা একটা কম্পিউটার স্ক্রিনের সাথে যুক্ত, যেখানে প্রতিটি যোদ্ধার অবস্থান একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর রিমোট কন্ট্রোলে চলছে বিমান আর বন্দুক, যেগুলো কোনো মানুষের নির্দেশ ছাড়াই একেবারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যের ওপর গুলি চালিয়ে দিচ্ছে।

লিবিয়া, সিরিয়া, কিংবা আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে এবং ইরান ও ইসরায়েলের মাঝে যে ড্রোন যুদ্ধ আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি, তা আমাদের চারপাশের চেনা জগৎটাকে খুব দ্রুত বদলে দিচ্ছে। আমেরিকা আর চীন যেন রীতিমতো পাল্লা দিয়ে নিত্যনতুন প্রযুক্তি আর ভয়ংকর সব অস্ত্রশস্ত্রে ঠাসা ড্রোনের পাহাড় গড়তে নেমেছে। এই পরিবর্তনটা অনেকটা সেই বিপ্লবের মতো, যখন বাইপ্লেন থেকে হাত দিয়ে বোমা ফেলার যুগ পেরিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একেবারে হিসেব কষে কৌশলগত বোমাবর্ষণ শুরু হলো, যার পরিণতিতে বিসমার্কের মতো বিশাল যুদ্ধজাহাজও সাগরের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। সেনাপতি আর সরকারগুলোর সামনে সম্ভাবনার এক বিশাল জগৎ খুলে দিয়ে ড্রোন এখন প্রচলিত যুদ্ধের সব নিয়মকানুন তছনছ করে দিচ্ছে। আজকাল অবশ্য এদের ব্যবহার নজরদারি করা কিংবা নির্দিষ্ট কোনো নিশানায় বিমান হামলার মতো দু একটা কাজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। তবে এই ছোট গণ্ডির ভেতর এরা খুব বেশিদিন আটকে থাকবে না।

সেনাবাহিনীগুলো এখন এমন এক চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে তাদের ঠিক করতে হবে বাহিনীর জন্য ঠিক কতগুলো ড্রোন তারা মজুত করবে। স্পেশাল ফোর্সের হাতের মুঠোয় থাকা ছোট ট্যাকটিক্যাল ড্রোন থেকে শুরু করে এফ সিক্সটিন যুদ্ধবিমানের সমান বিশাল সাইজের ড্রোন, সবই তো দরকার। আধুনিক যুগে সাধারণ মানুষ যখন চায় যুদ্ধে প্রাণহানি কম হোক, তখন মানুষের জীবনের চেয়ে একটি ড্রোনের ধ্বংস হওয়াটা অনেক বেশি মেনে নেওয়া যায়। আর এই সুবিধার কারণেই সোমালিয়া বা আফগানিস্তানের মতো জায়গায় আমরা কোনো সৈন্য না

পাঠিয়েই, স্রেফ সীমান্ত পেরিয়ে বছরের পর বছর ধরে অনন্তকালের এক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছি।

মসুল থেকে ফেরার পর আমি যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে নেমেছিলাম, তা হলো এই যুদ্ধ, মানে এই ড্রোন যুদ্ধগুলো কি সত্যিই একেবারে নতুন ধরনের কোনো যুদ্ধ? আর এগুলো আসলে কতটা কার্যকরী? যেকোনো নতুন প্রযুক্তিকে গেমচেঞ্জার হয়ে উঠতে হলে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হয়, আর মাথায় রাখতে হয় যে, শত্রুদের হাতেও ঠিক একই প্রযুক্তি থাকতে পারে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে পরিবর্তন এবং এই সামরিক প্রতিযোগিতায় চীনের মতো অন্যান্য দেশের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ঠিক একই সময়ে এই ড্রোন যুদ্ধেরও সূচনা ঘটেছে।

ভূমিকা

আতঙ্কের শহর

ড্রোন এখন সব জায়গায়। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। কলোরাডোর আকাশে হঠাৎ করেই রহস্যময় ড্রোনের বিশাল বহর দেখা গেল। কৃষকদের মনে চরম আতঙ্ক ধরিয়ে দেওয়া ওই ঘটনা মানুষকে ভাবিয়ে তুলল যে, এরপর না জানি কী হয়! এগুলো পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের আশেপাশেও ঘুরাঘুরি করতে পারে, যা লাখ লাখ মানুষের জন্য এক ভয়ংকর বিপদের কারণ হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের হিসাব ধরলে, এই ২০২০ সালেই এক ড্রোন হামলা চালিয়ে আমেরিকা ইরানের শীর্ষ কমান্ডার কাসেম সোলেইমানিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। সিরিয়া থেকে আজারবাইজান, লিবিয়া কিংবা ইয়েমেন, সব জায়গায় যুদ্ধক্ষেত্রকে একেবারে খোলনলচে বদলে দিচ্ছে এই ড্রোন।

ড্রোনের প্রধান ব্যবহারকারী, মানে সেনাবাহিনী আর নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর জন্য ইউএভি বা আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকলের বাজারটাও বেশ দ্রুত বড় হচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যেই সারা বিশ্বে ব্যবহারের তালিকায় বিশ হাজারেরও বেশি সামরিক ড্রোন যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। একসময় ড্রোন ছিল কেবল আমেরিকা আর ইসরায়েলের মতো আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গুটিকয়েক সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল। কিন্তু এখন তুরস্ক, চীন আর রাশিয়াও পাল্লা দিয়ে ড্রোন বানাচ্ছে। এমনকি তাইওয়ানের মতো ছোট দেশগুলোও খুব শিগগিরই সামরিক ড্রোনের বাজারে পা রাখতে যাচ্ছে। ব্যবসার দিক থেকেও এটা বিরাট এক বাজার। ২০১৯ থেকে ২০২৯ সালের মধ্যে সামরিক ড্রোনের পেছনে প্রায় ৯৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে বলে একটা হিসাব আছে। একটা সময় নৌবাহিনী যেমন বড়সড় আর সহজে আক্রান্ত হতে পারে এমন যুদ্ধজাহাজ বাদ দিয়ে ছোট অথচ দ্রুতগতির জাহাজের দিকে ঝুঁকেছিল, ঠিক তেমনি

সেনাবাহিনীগুলোও খুব তাড়াতাড়ি ট্যাংকের চেয়ে ড্রোনের পেছনেই বেশি টাকা ঢালতে শুরু করবে। সন্ত্রাসীরাও পিছিয়ে নেই। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য বানানো ড্রোনগুলো কিনে এনে তারা সেগুলোতে গ্রেনেড আর বোমা জুড়ে দিচ্ছে। সামরিক ইতিহাসে এটা একটা বিশাল বাঁকবদল, ঠিক যেমনটা ঘটেছিল জেট ইঞ্জিনের আবিষ্কার কিংবা রাইফেলের উদ্ভাবনের সময়।

ড্রোন বিষয়টা জন্মগতভাবেই বেশ আকর্ষণীয়, কিন্তু একই সাথে একে ঘিরে মানুষের ধারণাও বেশ অস্পষ্ট। এদেরকে ভিনগ্রহের কোনো বস্তু বলে মনে হয় এবং অনেকেই এর ব্যবহারকে অনৈতিক মনে করেন। কারণ ড্রোন বলতেই মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে চেহারা না থাকা কোনো এক শয়তানি যন্ত্রের ছবি, যা আকাশ থেকে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে নেমে আসে। আর আড়ালে বসে থাকা কোনো এক অদৃশ্য মানুষ অন্য মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ওপর নজরদারি চালায়। এরপরও ড্রোন চালকরা নিজেদের রীতিমতো পাইলট হিসেবেই বিবেচনা করেন, তা তারা টপ গান সিনেমার টম ক্রুজের মতো না হন, তাতে কী!

ড্রোন ওয়ারস এর এই দ্রুত গতির বর্ণনায় আমরা ড্রোন যুদ্ধের ইতিহাস, এর বর্তমান অবস্থা এবং এর পেছনের কারিগর থেকে শুরু করে সন্ত্রাসীদের খুঁটিনাটি সব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করব। ইসরায়েলি সৈন্যরা তাদের হালকা ওজনের ড্রোন কাঁধে নিয়ে পাহাড়ি পথ পেরিয়ে লেবাননের আকাশে ওড়ানোর দৃশ্য থেকে শুরু করে আমেরিকার স্ট্রাইক সেলের অপারেটররা বদ্ধ ঘরে বসে যেভাবে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ওপর নজর রাখে, তার সবকিছুই এই বইয়ে উঠে আসবে। ড্রোনের যে ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের নিচে আমরা এখন বাস করছি, তার মানুষ এবং যন্ত্রগুলোর এক চমৎকার মেলবন্ধন তুলে ধরবে এই বই। এতে যুক্ত হয়েছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন দেশ, প্রযুক্তি ও যুগের ড্রোন অপারেটর, জেনারেল আর ভেতরের মানুষদের সাথে নেওয়া সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ। এটা পৃথিবীর সব ড্রোনের কোনো বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ নয়, এটা হলো ড্রোনের প্রধান প্রযুক্তিগত দিক এবং এর শ্বাসরুদ্ধকর সব ব্যবহারের ওপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রতিটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে এই মানবহীন আকাশযানগুলোকে নিত্যনতুন উপায়ে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মূল বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে আছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গুপ্তহত্যা, নজরদারি, সন্ত্রাসবাদ এবং এর ভবিষ্যতের ব্যবহার। শিল্প খাতের সাথে জড়িত ব্যক্তি, সমাজকর্মী, উদ্ভাবক, কিংবা যারা এই ড্রোন যুদ্ধের বিভিন্ন দিক পরিচালনা করছেন, তাদের সবার সাক্ষাৎকারের মিশেলে এক বিশাল ক্যানভাসে আঁকা হয়েছে এই অসাধারণ গল্প।

ড্রোন ওয়ারস এর তথ্য জোগাড় করতে গিয়ে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জেনারেল এবং সিআইএ এর সাবেক পরিচালক ডেভিড পেট্রাউসের সাথে কথা বলেছি এবং যোগাযোগ রেখেছি। কথা বলেছি জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তা ডগলাস ফেইথের সাথে, যিনি লাদেনকে খোঁজার অভিযানের তদারকিতে ছিলেন। আরও কথা হয়েছে আফগানিস্তানে কাজ করা ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার রিচার্ড কেম্প, একজন অবসরপ্রাপ্ত আইরিশ স্পেশাল ফোর্সের কর্মকর্তা, পেন্টাগন আর মার্কিন বিমান বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকর্তা, লিবিয়ার ড্রোন অপারেটর, আইসিসের বন্দি সদস্য, কুর্দিশ যোদ্ধা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লকহিড মার্টিন ও ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞদের সাথে। ইসরায়েলের প্রথম ড্রোনগুলোর পেছনের মূল প্রকৌশলীও ছিলেন এই তালিকায়। ব্ল্যাকহক পাইলট থেকে শুরু করে মার্কিন ন্যাশনাল গার্ডের যেসব সদস্য প্রথম ট্যাকটিক্যাল ড্রোন ব্যবহার করেছিলেন, যারা ড্রোনের বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, ইরানের গোপন ড্রোন কর্মসূচির বিশেষজ্ঞ, এবং কীভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যুদ্ধের ময়দান পাল্টে দিচ্ছে তা নিয়ে কাজ করা গবেষকদের সাথেও আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে।

শুরুতেই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে ইসরায়েল এবং আমেরিকার ওপর, কারণ তারাই হলো ড্রোনের প্রধান কারিগর। এর পাশাপাশি পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ড্রোনের সাথে আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারও একটা পরিষ্কার ছায়া এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। এই বইয়ে ড্রোনের সামরিক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নজরদারি এবং গুপ্তহত্যা, এবং একে আরও ছোট, দ্রুত বা আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলার মতো বড় চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। একই সাথে সেইসব তাত্ত্বিকদের কথাও তুলে ধরা হয়েছে, যারা মনে করেন ড্রোন একদিন যুদ্ধবিমানের জায়গা দখল করে নেবে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে এদের ব্যবহার করা যাবে। ইরাকি কুর্দিরা কীভাবে পাহাড়ে তুরস্কের ড্রোন হামলা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে, আর বিমান প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা কীভাবে ইরানের ড্রোনের ঝাঁক প্রতিহত করার ছক কষছেন, তাদের সাথে আমার কথা বলার ওপর ভিত্তি করেই এই পুরো বিষয়গুলো সাজানো হয়েছে।

ড্রোনের ভবিষ্যৎটা আসলে অনেকাংশেই এখন আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ড্রোনকে একটানা কয়েকদিন আকাশে উড়িয়ে রাখার কিংবা তাতে দূরপাল্লার মিসাইল যুক্ত করার প্রযুক্তি এখন আমাদের হাতে। এমনকি এমন সব মিনি ড্রোনও তৈরি হয়ে গেছে, যেগুলো জঙ্গলের ভেতর অন্য ড্রোনগুলোকে নজরদারি করতে কিংবা টিয়ার

গ্যাস ছুঁড়তে সৈন্যরা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারে।

আজকাল দেশগুলো মূলত দুটো বড় সমস্যার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, ড্রোনের জন্য এখন যে 'প্ল্যাটফর্ম'গুলো আছে, সেগুলো বেশ সফল। নতুন কোনো প্ল্যাটফর্ম বানানোর বেলায় সেনাবাহিনীগুলো বড্ড ধীরগতিতে এগোয়। তাই একবার একটা এফ-সিক্সটিন বা এম-সিক্সটিন রাইফেল, একটা মেইন ব্যাটল ট্যাংক কিংবা একটা ডেস্ট্রয়ার হাতে পেয়ে গেলে, তারা দশকের পর দশক ওটা নিয়েই পড়ে থাকে। একটা প্রিডেটর মডেলের ড্রোন হাতে আসার পর তাদের কাজ হয় কেবল ওগুলোরই আরও বেশি কপি বানানো। একটু বড়, একটু দ্রুতগতির করা, কিংবা ওগুলোতে আরও বেশি গোলাবারুদ, রাডার আর ক্যামেরা বসিয়ে দেওয়া। সামরিক ভাষায় একে বলে প্ল্যাটফর্মে আরও বেশি 'সেন্সর' যোগ করা। প্রথম সমস্যাটা ঠিক এখানেই। পরবর্তী ড্রোন বিপ্লবের আগেই সেনাবাহিনীগুলো একটা বোতলবন্দি অবস্থায় এসে আটকে গেছে। এই বইয়ের পাতায় পাতায় আমরা দেখব ঠিক কীভাবে এই ঘটনাটা ঘটল।

আচ্ছা, আকাশে আরও বেশি স্টেলথ ড্রোন দেখা যায় না কেন? সাধারণ মানুষ আর বিদেশি আকাশসীমায় নজরদারি করার জন্য একটা ড্রোন বানাতে ইউরোপের দেশগুলোর কেন দশ বছর লেগে যায়? আমেরিকা কেন তাদের ড্রোন রপ্তানি করল না, আর কেনই বা তারা চীনকে ধীরে ধীরে তাদের টপকে যাওয়ার সুযোগ দিল? এই সবকিছুর মূলে আছে ওই প্ল্যাটফর্ম বদলাতে না পারা এবং ভবিষ্যৎকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের সেকেলে অনীহা।

দ্বিতীয় সমস্যাটা হলো, সেনাবাহিনীগুলো এখনো তাদের হাতের মুঠোয় থাকা এই বিশাল ক্ষমতার সাথে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারেনি। ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা যেখানে উড়ন্ত গাড়ির মতো ড্রোন দিয়ে আকাশ ভরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে বাস্তবের সেনাপতিরা এই উড়ন্ত যন্ত্রগুলোকে এড়িয়েই চলেছেন। সন্ত্রাস দমনে কাজ করেন এমন এক পুলিশ কমান্ডারের সাথে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন, তাকে যে বিশাল এলাকার নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তার ইউনিটে ড্রোন আছে মাত্র কয়েকটা। কারণ কী? কারণ হলো বাজেটের টানাপোড়েন আর দূরদৃষ্টির অভাব।

এর মানে হলো, ড্রোন নিয়ে ভাবার মতো কোনো সামরিক স্বপ্নদ্রষ্টা এখনো তৈরি হয়নি। এমন কোনো ড্রোন প্যাটন বা ড্রোন রোমেল এর দেখা মেলেনি, যিনি ১৯৩০ এর দশকে ট্যাংক কমান্ডাররা যেমন ট্যাংকের ভেতর এক বিশাল বিপ্লব

দেখেছিলেন, তেমনি ড্রোনের ভেতরও সেটা দেখতে পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যুদ্ধজাহাজগুলোকে যেভাবে ড্রেডনটে রূপান্তর করা হয়েছিল, ড্রোনের ক্ষমতার ক্ষেত্রে এমন কোনো পথপ্রদর্শক নেই। এমন কোনো দেশ নেই, যারা হাজার হাজার ড্রোন বানিয়ে তাদের পুরো ডিভিশনকে সেগুলো দিয়ে সাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রকে এসব যন্ত্র দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। এর বদলে সেনাবাহিনীগুলো চায় একেবারে নিখুঁত হামলা। আর তারা যখন এসব পণ্য কেনে, তখন সেগুলোতে এত বেশি প্রযুক্তি ঠেসে দিতে চায় যে, দামটা এক লাফে মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমেরিকার গ্লোবাল হক সার্ভিল্যান্স ড্রোন হাতে পেতে ন্যাটোর বছরের পর বছর সময় লেগেছিল। আর শেষমেশ তারা কিনল মোটে পাঁচটা ড্রোন, যার দাম পড়ল প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার!

আমরা সামনেই দেখব, এই জোড়া সমস্যাই হলো সেই বাধা, যা ড্রোন বিপ্লবকে অবশ্যই পার হতে হবে। তবে আশার কথা হলো, আমরা এখন অন্ধকারের শেষে আলোর রেখা দেখতে শুরু করেছি। ইরান যেভাবে ড্রোনের ঝাঁক ব্যবহার করেছে, তা পশ্চিমা দেশগুলোকে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। লিবিয়ার যুদ্ধে তুরস্কের সস্তা ড্রোনগুলো যেভাবে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, তা প্রমাণ করে যে ড্রোন চাইলে মুহূর্তের মধ্যেই আস্ত একটা বিমান বাহিনীর রূপ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।

বছরের পর বছর ধরে ড্রোন যুদ্ধের অনেক রথী মহারথী এসেছেন এবং চলেও গেছেন। তৈরি হয়েছে অনেক মিথ্যা আশা, অনেক অচলাবস্থা আর অনেক ভুয়া স্বপ্নদ্রষ্টা। একেবারে সামনেই এমন এক ভবিষ্যৎ উঁকি দিচ্ছে, যেখানে সেনাবাহিনীগুলো ড্রোন নিয়ে যুদ্ধে নামবে। আর যার কাছে সবচেয়ে সেরা ড্রোন এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, জয় তার গলাতেই মালা পরাবে। তবে ড্রোন বনাম ড্রোন যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। যুদ্ধে বড় বড় ড্রোনের ব্যবহার এবং সেগুলো ভূপাতিত হওয়ার সংখ্যা এখন বহুগুণে বেড়ে গেছে। ১৯৮০ এর দশকে যেখানে বছরে কয়েকটা ড্রোন মারা পড়ত, সেখানে ২০২০ সাল নাগাদ সেই সংখ্যা বছরে শতকে গিয়ে ঠেকেছে। তা সত্ত্বেও, আমরা এখনো বাইপ্লেন আর আদি যুগের ট্যাংকের আমলেই পড়ে আছি। ড্রোন এখনো তার আসল ক্ষমতার পুরোটা দেখাতে পারেনি। কীভাবে এমনটা হলো আর কীভাবে সেই বিশাল বাঁকবদলের সময়টা ঘনিয়ে আসছে, এই বই সেই রহস্যেরই জট খুলবে।

আজকের দিনের সেনাপতিদের শেকড় এখনো অতীতেই আটকে আছে। তারা তো আর ট্যাবলেট আর ড্রোন নিয়ে বড় হননি। নব্বইয়ের দশকের যুদ্ধ করার জন্যই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। যখন আজকের তরুণরা জেনারেলের পদে বসবেন, তখন প্রতিটি প্লাটুনে একজন করে ড্রোন অপারেটর এবং ড্রোন ওড়ানোর জন্য ট্যাবলেট থাকার ইচ্ছাটা বাস্তব রূপ নেবে। তৈরি হবে ড্রোনের একটার পর একটা স্তর আর শত্রুর ড্রোনের ঝাঁক ঠেকাতে থাকবে নিশ্ছিদ্র আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তবে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হলে আমাদের আগে দেখতে হবে, একেবারে শুরুতে ড্রোন জিনিসটা পৃথিবীতে এল কীভাবে।

মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা এই ড্রোন যুদ্ধকে বুঝতে গিয়ে আমি ড্রোন নিয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই শুরু করেছিলাম। সেই নব্বইয়ের দশকের কথা, তখন আমি মানবহীন আকাশযান ব্যবস্থা এবং এর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করতাম। ভাবতাম, এগুলো কীভাবে ভবিষ্যতের যুদ্ধকে একদম বদলে দেবে। পরে, ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের সময় আমি দেখলাম কীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন একেবারে ডালভাতে পরিণত হলো। আমি ইরাক এবং ইউক্রেনে ড্রোনের ব্যবহার দেখেছি। আর একজন সাংবাদিক হিসেবে ড্রোনের হুমকি এবং এর বিপরীতে তৈরি হওয়া আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে খবর সংগ্রহ করেছি।

ইসরায়েলে আমি কথা বলেছি ড্রোন পাইলট, সৈন্য এবং পুলিশ কমান্ডারদের সাথে। আমি ড্রোনের বড় বড় নির্মাতাদের কাছে গিয়েছি, তাদের অ্যাসেম্বলি লাইন ঘুরে দেখেছি এবং তাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে আড্ডা দিয়েছি। মজার ব্যাপার হলো, এদের অনেকেই সাবেক পাইলট। আমি ইসরায়েলের ড্রোন কর্মসূচির পেছনের কারিগরদের সাথে কথা বলেছি। এরপর নব্বইয়ের দশক এবং ২০০০ এর দশকে যারা ড্রোন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আমেরিকার সেইসব গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এবং সৈন্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এই তালিকায় ছিলেন পাইলট আর জেনারেলরা, ছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোর বড় বড় কর্তারা এবং কংগ্রেসে কাজ করা সাবেক কর্মীরা। অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী কীভাবে ড্রোন ব্যবহার করছে, তা বুঝতে আমি যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডের কমান্ডারদের সাথে বসেছি। পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে তুরস্কের বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলেছি। এমনকি যারা ইরানের ড্রোন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন, তাদের সাথেও আলাপ জমিয়েছি। আইসিসের ড্রোনের হুমকির মুখে বছরের পর বছর ধরে মাঠে কাজ করার অভিজ্ঞতা, সেনাবাহিনীগুলো কীভাবে ড্রোন ব্যবহার করছে তা স্বচক্ষে দেখা, আর এর পাশাপাশি এক বছর ধরে দুনিয়ার সবচেয়ে

জ্ঞানী মানুষদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ফসল হলো এই বই। এই মানুষদের মধ্যে যেমন সশস্ত্র ড্রোনের সমালোচকরা আছেন, তেমনি আছেন সেই স্বপ্নদ্রষ্টারা, যারা বিশ্বাস করেন ড্রোন একদিন আমাদের চেনা পৃথিবীটাকে একেবারেই বদলে দেবে।

ড্রোনের বিকাশ বেশ ধীরগতির একটা প্রক্রিয়া ছিল। কিন্তু এর ব্যবহার বেড়েছে একেবারে জ্যামিতিক হারে। কেবল গত কয়েক বছরেই সংঘাতের দুই পক্ষেই ড্রোনের ব্যবহার এবং এগুলোকে গুলি করে নামানোর জন্য আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে চোখে পড়ার মতো দ্রুতগতিতে। মাঠে নামানো হচ্ছে লেজার অস্ত্র, বাড়ছে ড্রোনের রকমফের। আর এর মধ্যেই সেনাবাহিনীগুলো এই নতুন প্ল্যাটফর্মের জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। ড্রোন এখনো তার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় পৌঁছাতে পারেনি। আর যারা এখনো স্বপ্ন দেখেন যে এমন একটা যুগ আসবে যখন বিমান বাহিনীতে কোনো পাইলট থাকবে না, পশ্চিমা দেশগুলোতে এই প্রযুক্তির ধীর অগ্রগতি দেখলে তারা সত্যিই বেশ অবাক হবেন।

কিন্তু এই বিপ্লব এখন খুব দ্রুত চীন, তুরস্ক এবং অন্য দেশগুলোর দিকে মোড় নিচ্ছে। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে, ড্রোন যুদ্ধের গল্পটা নেহাতই কিছু যন্ত্রপাতির গল্প নয়। এটা আসলে ক্ষমতার পালাবদলের গল্প। নব্বইয়ের দশকের পর আমেরিকা ছিল দুনিয়ার একমাত্র পরাশক্তি, আর এখন তাদের সাথে পাল্লা দিচ্ছে চীন আর ভারতের মতো উঠতি দেশগুলো। ড্রোনের এই উত্থান সরাসরি আমেরিকার বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে ছিল। এখন সেই সংঘাত রূপ নিয়েছে আমেরিকা-চীন আর আমেরিকা-ইরান প্রতিযোগিতায়। আর এর সাথেই তাল মিলিয়ে বদলাচ্ছে ড্রোন যুদ্ধ। সারা পৃথিবীতেই ড্রোন এখন আপন মহিমায় জ্বলে উঠছে।

প্রথম অধ্যায়

ড্রোনের ভোর : কারা অগ্রগামী?

সালটা ১৯৮৩। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্যাসপার ওয়েইনবার্গার একটা বেশ চমকে দেওয়া ব্রিফিং পেলেন। তিনি সদ্য লেবানন সফর থেকে ফিরেছেন। তাকে একটা ভিডিও দেখানো হলো। ভিডিওটা তার ওই সফরের সময়ের, আর সেটা ধারণ করেছে ইসরায়েলের একটা মানবহীন আকাশযান। রিগ্যান প্রশাসনে ইসরায়েলের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ওয়েইনবার্গারকে বেশ শীতল স্বভাবের মানুষ হিসেবেই ধরা হতো। তবে সম্পর্ক যত অম্লমধুরই হোক না কেন, ড্রোন জিনিসটা তার মনে দারুণ কৌতূহল জাগিয়েছিল। ১৯৮৩ সালের জুনে আমেরিকা চাইল, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ঠেকানোর বিষয়ে ইসরায়েল যেন একটা পুরনো চুক্তির নবায়ন করে।

সময়টা তখন স্নায়ুযুদ্ধের একদম চরম পর্যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান মস্কোর সেই ইভিল অ্যাম্পায়ার বা শয়তানের সাম্রাজ্যকে একেবারে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে চাইছিলেন। নতুন সামরিক প্রযুক্তির দৌড় তখন তুঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলিরা সাধারণত পশ্চিমা সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সিরিয়ানদের মুখোমুখি হতো। ইসরায়েলিরা যদি নতুন কোনো অস্ত্র বানাতে পারে, তবে সেই ভাগ বসাতে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

আমেরিকা তখন নিজেদের সামরিক প্রযুক্তির একটা বড় শূন্যস্থান পূরণের জন্য রীতিমতো কুস্তি লড়ছিল। সত্তর দশকে আমেরিকানরা রিমোট পাইলটেড ভেহিকেল নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিল। ইউটা টেস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং রেঞ্জে রাডার থেকে সংকেত পাঠানো লক্ষ্যবস্তুর ওপর তারা এগুলো ব্যবহার করে। তবে ঘটনা

হলো, হাজার হাজার মাইল দূরে ইসরায়েলে তখন এমন এক বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছিল, যা যুদ্ধের চিরচেনা রূপটাই একেবারে বদলে দেবে।

১৯৭৪ সাল। ইয়াইর দুবেসতার তখন একজন তরুণ ইসরায়েলি প্রকৌশলী। ইসরায়েল তখন ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। আড়াই হাজারের বেশি ইসরায়েলি প্রাণ হারিয়েছে, হাজারখানেক ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে, আর খোয়া গেছে একশোর বেশি যুদ্ধবিমান। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে মাত্র ছয় দিনের মাথায় বেশ কয়েকটি আরব দেশের সেনাবাহিনীকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর যে ছোট্ট দেশটা সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, তাদের জন্য এই অভিজ্ঞতাটা ছিল ঘোর ভাঙানোর মতো।

দুবেসতার তখন ইসরায়েলের অভিজাত টেকনিওন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন, পাশাপাশি কাজ করছেন ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ বা আইএআইতে। ঠিক সেখানেই তৈরি হচ্ছিল প্রথম মানবহীন আকাশযান। তিনি বলেন, আমরাই যে প্রথম এটার কথা ভেবেছিলাম তা নয়, তবে প্রথম কার্যকরী সিস্টেমটা আমরাই বানিয়েছিলাম। ২০২০ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকের কথা। করোনা ভাইরাসের থাবা তখনো দুনিয়াকে গ্রাস করেনি। আমি দুবেসতারকে ফোন করলাম। তিনি বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন, ড্রোন নিয়ে কাজ করা তার জীবনের কয়েক দশকের নানা গল্প শোনাচ্ছিলেন। সত্তরের দশকের শেষের দিকের স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলছিলেন, ইসরায়েলের প্রধান সমস্যা ছিল শত্রুদের ব্যাপারে একদম রিয়েল টাইম বা তাৎক্ষণিক গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া। এর মানে হলো স্রেফ ছবি তোলার জন্য বিমান পাঠানো নয়, বিমানগুলো যেন একই সাথে ভিডিও পাঠাতে পারে সেই ব্যবস্থা করা।

১৯৭৩ সালের আগে ইসরায়েল ড্রোনের জন্য আমেরিকার টেলিডাইন রায়ান কোম্পানির সাথে একটা চুক্তি করে। ফায়ারবিজ নামের প্রথম বারোটা ড্রোন ১৯৭১ সালে ইসরায়েলে এসে পৌঁছায়। এগুলো ছিল একেকটা বিশাল দানব, ওজন দুই হাজার পাউন্ডের বেশি। টার্বোজেট ইঞ্জিনের এই ড্রোনগুলো ঘণ্টায় ৪৮৫ মাইল বেগে ৬০ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়তে পারত। এগুলো আদতে ছিল ছোট ডানাওয়ালা রকেট। মজার ব্যাপার হলো, এদের জন্ম হয়েছিল উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। এভাবেই ইসরায়েলি ড্রোন কর্মসূচির জন্ম হয়েছিল একটা আমেরিকান উড়ন্ত ফাঁদ বা ডিকয় থেকে। ইসরায়েল ভেবেছিল, এগুলো দিয়ে শত্রুদের রাডার আর মিসাইলকে ধোঁকা দেওয়া যাবে। মিসরীয়দের বিশাল এক সেনাবাহিনী ছিল, আর তাদের হাতে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দেওয়া অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল।

এমন কোনো মানবহীন আকাশযানের তখন বড্ড দরকার ছিল, যা অমূল্য পাইলটদের প্রাণহানি কমাতে পারে।

ইসরায়েলের পালমাচিম বিমান ঘাঁটিতে একটা বিশেষ ইউএভি ইউনিটের উদ্বোধন করা হলো। ঘাঁটিটা ছিল একটা জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি বালিয়াড়ির ভেতর লুকানো। মিসরের কাছে থাকা সোভিয়েতদের দেওয়া সারফেস টু এয়ার বা ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য মিসাইলের বিরুদ্ধে এই ফায়ারবিগুলোকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেফিডিম বিমান ঘাঁটি থেকে উড়ে এগুলো দারুণ কার্যকরী প্রমাণ হয়। ইসরায়েল এরপর আমেরিকার তৈরি চুকার সহ আরও কিছু ড্রোন সংগ্রহ করে। এগুলোকেও ফাঁদ হিসেবে ব্যবহারের কথা ছিল। সংগ্রহ করা এমন সাতাশটি ড্রোনের নাম দেওয়া হয়েছিল তেলেম। চুকারগুলো আসল ড্রোনের চেয়ে সুইসাইড ড্রোন হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিল, এদের বানানোই হয়েছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে ২৩টি চুকার ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে ৫টি ধ্বংস হয়। যুদ্ধে ফায়ারবিগুলোরও ভয়াবহ দশা হয়েছিল। মাত্র দুটি টিকে ছিল।

ইসরায়েলিরা বুঝতে পারল, তাদের আরও অনেক বিকল্প দরকার। এমন কিছু, যা বিমান বাহিনীর ভাষায় একেবারে সত্যের মুহূর্তে গোয়েন্দা তথ্য বা ইন্টেলিজেন্স অ্যাট দ্য মোমেন্ট অব ট্রুথ এনে দিতে পারবে। একটা প্রতিনিধি দলকে বিদেশে পাঠানো হলো এটা দেখতে যে আর কী কী পাওয়া যেতে পারে। ইসরায়েল ফিলকো ফোর্ড এবং আরটি কোম্পানির বানানো ড্রোনের দিকে নজর দিল। আমেরিকানদের কাছে এমন অনেক যন্ত্র এমনিতেই পড়ে ছিল। বিবর্তনের ধারায় এই ড্রোনগুলোকে পাইলটচালিত বিমান আর ইউএভির মাঝখানের সেই হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র হিসেবে চিন্তা করতে পারেন, ঠিক বিবর্তনের ওই কানাগলিগুলোর মতো। এর কয়েকটা দেখতে ছিল বড়সড় মডেলের বিমান বা মিসাইলের মতো। এগুলোর নকশাকারীদের মাথায় বুদ্ধি ছিল যে এর ওপর লেজার ডেজিগনেটর বা অন্যান্য গ্যাজেট বসিয়ে দেওয়া যায়, যা কি না পরবর্তীতে ড্রোনের একেবারে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

ভিয়েতনামে সারফেস টু এয়ার মিসাইলগুলোর ওপর নজর রাখতে আর তাদের ধোঁকা দিতে ড্রোনের কিছু সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছিল। ষাট এবং সত্তরের দশকে এমন ৯৮০টির বেশি ড্রোন বানানো হয়, যার মধ্যে ৪৪১টি ভিয়েতনামে ধ্বংস হয়। মহাকাশ যুগের অন্যান্য অনেক উদ্ভাবনী আমেরিকান প্রকল্পের মতো এগুলোকেও